ATHENA, VOLUME VII, JULY 2023 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 182–191
www.athenajournalcbm.in

ঔপনিবেশিক আমলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা: ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

নির্মল প্রধান*

প্রাপ্ত: ২৮/০২/২০২৩ পরিমার্জন: ২৯/০৫/২০২৩ গৃহীত: ০৯/০৬/২০২৩

সারসংক্ষেপ: *ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসনকাল গবেষণা সন্দর্ভের ক্ষেত্রে এক অন্যতম গুরুত্বের দাবিদার। এই সময়কালে নানা গবেষক নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের চর্চিত গবেষণার বিষয়টিকে উপস্থাপিত করে থাকেন। ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় এক যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। বর্তমানে চিকিৎসাজগতে চিকিৎসার বহুধারা আমরা দেখতে পাই। যেমন – ঔষধি চিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, মূত্র চিকিৎসা, জল চিকিৎসা, অকুপ্রেসার চিকিৎসা, গন্ধ চিকিৎসা, বর্ণ চিকিৎসা, স্পর্শ চিকিৎসা, শব্দ চিকিৎসা, সঙ্গীত চিকিৎসা, ব্যবহারিক চিকিৎসা, সাইকিকথেরাপি, ফিজিওথেরাপি, মেসমারিজম, চুম্বক চিকিৎসা, যোগ চিকিৎসা প্রভৃতি। এর সবকয়টি যে সমানভাবে বা ব্যাপকভাবে সুপরিক্ষিত, কার্যকারী তা কিন্তু নয়। সরকারিভাবেও স্বীকৃত নয় কোনো কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি। তবে অল্পবিস্তর ফল সব চিকিৎসাতেই পাওয়া যায়। তবে মুখ্য চিকিৎসা সন্দেহাতীতভাবে দুটি – শল্য চিকিৎসা আর ঔষধি চিকিৎসা। শল্য চিকিৎসাকে বিভক্ত করা যায় ওপেন ও নন-ওপেন। ঔষধি চিকিৎসারও আবার কতগুলি শাখা আছে, যেমন – অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদী, ইউনানী, বায়োকেমিক ইত্যাদি। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অ্যালোপাথি চিকিৎসাপ্রণালী নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও প্রায় একই সময়ে বেসরকারি প্রচেষ্টায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপ্রণালীরও প্রবর্তন হয়। তাই আলোচ্য নিবন্ধে আমরা ঔপনিবেশিক আমলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিষয়টি যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নিয়েছি।*

সূচক শব্দ: *অ্যানাটমি, অ্যালোপ্যাথি, মায়াজম, সাইকিক থেরাপি, মেটারিয়া মেডিকা।*

* এম.ফিল. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail: nirmalpradhan1990@gmail.com

ঔপনিবেশিক আমলের পূর্বে ভারতের প্রাচীন সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম। এমনকি বলা যেতে পারে ভারতের সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনিক চিকিৎসক সমাজের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সুসংবদ্ধ। বৈদিক যুগের চিকিৎসা ব্যবস্থা যথা ঋকবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদে চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অথর্ববেদকে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে অন্যতম প্রাচীন আকর গ্রন্থ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ অথর্ববেদে জ্বর, যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগব্যাধির চিকিৎসার বর্ণনা রয়েছে। পরবর্তী বৈদিক যুগে কায়তন্ত্র (ওষুধবিদ্যা), শল্যতন্ত্র (অস্ত্রচিকিৎসা), শালাক্যতন্ত্র (চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা সংক্রান্ত), কৌমার ভৃত্যতন্ত্র (শিশুরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক), ভূততন্ত্র (মানসিক রোগ), বাজীকরণতন্ত্র (জনন সংক্রান্ত) প্রভৃতি চিকিৎসার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্ষেত্রে চার্বাক, চরক, সুশ্রুতের ভুমিকাও ছিল অন্যবদ্য। এছাড়া অবদান ছিল বাগভট্ট, চক্রপাণিদত্ত, মাধবকর, বৃন্দ, উপধেনব, বৈতরণ প্রমুখের। চরকের 'চরক সংহিতা', ও সুশ্রুতের 'সুশ্রুত সংহিতা' আয়ুর্বেদশাস্ত্র ও শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সময় বৃদ্ধবাগভট্ট চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতার সমন্বয়ে রচনা করেন 'অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ', কনিষ্ঠবাগভট্ট অনুরুপ ভাবে 'অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা' রচনা করেন। মাধবকর রচনা করেন রোগনিরুপণবিদ্যা বা 'নিদান'। প্রাচীন যুগের গণ্ডি ছাড়িয়ে মধ্যযুগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে ইউনানি চিকিৎসাবিদ্যা ছিল মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি অন্যতম চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতিটি মূলত গ্রীক, ভারতীয়, মিশরীয়, পারসিক ও চিনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত। এই সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে ঔপনিবেশিক আমলের চিকিৎসা পদ্ধতি।

চিকিৎসাশাস্ত্রে হোমিওপ্যাথির আগমন

সাধারণত আরোগ্যের যে বিজ্ঞান ও কলা প্রকৃতির মৌলিক নিয়মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাকেই হোমিওপ্যাথি বলে। মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-এর মতে সুস্থ অবস্থায় কোনো ঔষধি অধিক মাত্রায় সেবন করলে শরীরে যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাদৃশ লক্ষণ যুক্ত রোগ উক্ত ঔষধের অত্যল্প পরিমাণ মাত্র প্রয়োগে প্রশমিত হওয়ার নাম হোমিওপ্যাথি।[১] ভারতবর্ষের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের আগমন ঠিক কবে, কিভাবে হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে অনুমান করা হয় ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে একজন জার্মান ভূতত্ত্ববিদ এবং সমসাময়িক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক ডাক্তার স্যামুয়েল ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডারিক হ্যানিম্যান ভারতবর্ষে এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রকে নিয়ে আসেন।[২] শরৎচন্দ্র ঘোষ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন চিকিৎসক ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই চিকিৎসাব্যবস্থার উত্থানের বিষয়টিতে আলোকপাত করেছেন। লন্ডন মিশনারি সোসাইটির ডাঃ রেভারেন্ড মুলেনস ভবানীপুর অঞ্চলে অনেকদিন হোমিওপ্যাথি ঔষুধ বিতরণ করেন। অবসর প্রাপ্তকালীন সার্জন স্যামুয়েল বুকিং তাঞ্জোরে ১৮৪৭ সালে একটি হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল পত্তন করেন। পুসিন জজ মিঃ ডিলাটর কলেরা অধ্যুষিত ডায়মন্ডহারবারে বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিতরণ করেন। ডাঃ কুপার ও ডাঃ জে. রাদারফোর্ড রাসেল অবসর গ্রহণের পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করেন। এমনকি মি. এইচ. রাইপারও খিদিরপুরের কুলিবাজারে বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিলি করতেন।[৩] হ্যানিম্যান ওষুধ চিকিৎসার প্রধানত তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। প্রথম পদ্ধতিতে এমন ওষুধ রোগীর দেহে প্রয়োগ করা হয়, যার রোগীর লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে, পদ্ধতিটির নাম অ্যান্টিপ্যাথি, দ্বিতীয় পদ্ধতিতে রোগীর লক্ষণের সঙ্গে কোনোই মিল নেই, অর্থাৎ না-সম না-বিপরীত লক্ষণযুক্ত এমন ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। এই পদ্ধতি হল অ্যালোপ্যাথি বা হেটারোপ্যাথি। আর তৃতীয় পদ্ধতিতে রোগীর চিকিৎসা করা হয় সম লক্ষণযুক্ত ওষুধ দ্বারা, এই চিকিৎসা পদ্ধতির নাম হোমিওপ্যাথি। অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেখা গেছে রোগ – নিরাময়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অতুলনীয়। অন্যভাবে বলা যায় অধিকাংশ রোগের সঠিক ওষুধ চিকিৎসাপদ্ধতির নাম হোমিওপ্যাথি।[৪]

ব্রিটিশ পরিচালিত বাংলায় হোমিওপ্যাথিকে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত। বাংলার

বাইরে হোমিওপ্যাথিকে জনপ্রিয় করে তোলেন ডাঃ লোকনাথ মৈত্র। তিনি হোমিওপ্যাথির সাহায্যে লেফটেন্যান্ট গভর্নর জর্জ আইরনসাইড-এর স্ত্রীর জীবন রক্ষা করেন। পরবর্তীকালে তাঁর সহায়তায় বেনারসে একটি হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল গড়ে ওঠে।[৫] ধীরে ধীরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র যতই জনপ্রিয় হতে থাকল ভারতীয় সমাজে ততই চিকিৎসাবিজ্ঞানের দুই শাখা অর্থাৎ অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল। এই ঠাণ্ডা লড়াই-এর প্রসঙ্গে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও তাঁর পুত্র অমৃতলাল সরকারের লিখিত তথ্য আমাদের কাছে প্রমাণস্বরূপ বিরাজমান।[৬] হোমিওপ্যাথিতে পদার্পণ করার পর স্বয়ং মহেন্দ্রলাল অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। মহেন্দ্রলাল সরকার বিদ্যাসাগর ও ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্তের প্রভাবেই হোমিওপ্যাথিতে আকৃষ্ট হন।[৭] হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আলোচনা প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে ভারতীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের তুলনা করা যেতে পারে। সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও উচ্চপদস্থ অফিসারদের মধ্যে অনেকেই হোমিওপ্যাথিকে সমর্থন করত। তাঁদের মধ্যে স্যার হেনরী মেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবে লর্ড মেয়ো একজন হোমিওপ্যাথির চিকিৎসককে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটের উপহাসের জন্য ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিয়োগের অধিকার তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। কারণ ইংল্যান্ডের সরকার যখন হোমিওপ্যাথিকে সমর্থন করত না তখন তার অধীনস্থ ভারত সরকার হোমিওপ্যাথিকে সমর্থন করবে এটা আশা করা যায় না।[৮]

রোগ ও আদর্শরোগী

বিংশ শতাব্দীতে তথাকথিত আধুনিক চিকিৎসা শুরু হওয়ার কারণে, অকারণে ও বেনিয়মে বহুল ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক, স্টেরয়েড, অ্যানালোজেসিক, কেমোথেরাপিউটিক, ওয়াল কন্ট্রাসেপ্টিংস এবং আরও বহু ওষুধের সাংঘাতিক ক্ষতিকারক ক্রিয়ায় মানবদেহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বহু রোগের জটিল আধারে পরিণত হচ্ছে। বহু প্রজন্ম দূষিত, পরিবেশ দূষিত এবং ওষুধ দূষিত এমন জটিল মানব শরীরকে সম্পূর্ণভাবে দূষণমুক্ত করা বস্তুত এক জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। যদিও মানবশরীরকে দূষণমুক্ত মায়াজেমেটিক দোষবর্জিত করার শ্রেষ্ঠ এবং সম্ভবত একমাত্র উপায় হোমিওপ্যাথি এ্যান্টিমায়াজেমেটিক চিকিৎসা।[৯] হোমিওপ্যাথি একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। আরোগ্য লাভের জন্য চিকিৎসায় বিশ্বাস ও আস্থার ভীষণ দরকার। সে কারণে হোমিওপ্যাথি ও তার পরিধি সম্পর্কে রোগীর মোটামুটি ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এটি একটি সুকঠিন, জটিল ও নির্ভুল চিকিৎসা পদ্ধতি, যার সাফল্য নির্ভর করে অত্যন্ত দক্ষতাপূর্ণ রোগীর বিবরণ বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের উপর।[১০]

একজন আদর্শ রোগী চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে ভালো করে ভেবে রাখবেন রোগের ইতিবৃত্ত। পূর্ব চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র থাকলে চিকিৎসকের কাছে সেগুলি প্রথমদিন নিয়ে যাবেন। তারপর গুছিয়ে প্রথম থেকে সেদিন পর্যন্ত রোগের অগ্রগতির পূর্ণ বিবরণ দেবেন। অনেক রোগী আছেন যারা রোগ যন্ত্রণার কথা অতিরঞ্জিত করে বলতে অভ্যস্ত। আবার ওষুধের দ্বারা কষ্টের সিংহভাগ উপশম ঘটলেও স্বীকার করতে চান না। সঠিক চিকিৎসার স্বার্থে কোনো রোগীরই রোগলক্ষণ বা সেই লক্ষণের উপশমের মাত্রা অহেতুক বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলা উচিত নয়। কারণ এই চিকিৎসা পদ্ধতি এতই সুক্ষ যে রোগ লক্ষণের বিচার যত সূক্ষভাবে করা যাবে, ততই ওষুধের নির্বাচন নিখুঁতভাবে করা সম্ভব হবে। খাদ্যাভ্যাস, জীবনাভ্যাস, ওষুধ খাওয়ার নিয়ম, নিষিদ্ধ খাদ্য বিষয়ে চিকিৎসকের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে যত পালন করা যাবে, ততই আদর্শ রোগী হওয়া যাবে এবং সম্ভবপর হবে শীঘ্রই রোগ নিরাময়। হোমিও ওষুধ সূর্যালোকে বা কোনো উত্তপ্ত বা স্যাঁতসেঁতে স্থানে রাখা নিষিদ্ধ। কারণ, ওষুধ গুণের উৎকর্ষতা এর ফলে হ্রাস পেতে বা নষ্ট হতে পারে। রোগীর এ বিষয়ে অসতর্ক থাকা বাস্তবিক পক্ষে অনুচিত।[১১]

ভ্রান্ত ধারণা

বর্তমানে সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী নিজ নিজ দেশে হোমিও ওষুধ নিয়ে গবেষণারত; আমাদের

দেশেও এই গবেষণা চলছে অনেকটাই ব্যক্তিগত প্রয়াসে। গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, হোমিও ঔষধে আপাতভাবে কোনো ওষুধজ পদার্থের অস্তিত্ব নেই, ওষুধ গবেষণাগারে গিনিপিগের উপর প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছে, তার ভিতরকার নিহিত সূক্ষ্মশক্তি সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে স্নায়ুকে অবলম্বন করে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায় এবং ক্রিয়া শুরু করে দেয়। ফলে শুরু হয়ে যায় তার মধ্যে নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন। যাকে সামগ্রিকভাবে আমরা সেই ওষুধের লক্ষণ সমষ্টি বলি।[১২] 'বিশ্বাস' এই বিষয়টির উপর এখন একটু আলোকপাত করা দরকার। শুধু বিশ্বাসে রোগ নিরাময় হয় না বটে, তবে বিশ্বাস মানসিক নির্ভরতা, মানসিক দৃঢ়তা আনয়নের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ে অবশ্যই সাহায্য করে। সুতরাং যে কোনো চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশ্বাসেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সর্বপেক্ষা যে ভ্রান্তধারণাটি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপ্ত, সেটি হল— "হোমিও ওষুধ উপকার না হলেও অন্তত অপকার হবে না"।[১৩]

'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগ সারতে বিলম্ব হয়'— আর একটি ধারণা যা মানুষের বিশ্বাসে ভীষণভাবে ব্যাপৃত। দেখা গেছে, অনেক গভীর রোগে (Acute Disease) হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সঠিক প্রয়োগ খুব দ্রুত রোগীর যন্ত্রণা বা কষ্ট দূর করতে সক্ষম। অন্যদিকে এরকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপর যে কোনো চিকিৎসা পদ্ধতিতে ওষুধ তীব্র গতিতে কাজ করে রোগীকে দ্রুত আরাম দিতে ব্যর্থ, এও দেখা গিয়েছে। প্রধানত সুচিকিৎসকের কাছে যে রোগীরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করান তাদের এমন অভিজ্ঞতা নতুন নয়।[১৪] একটি বদ্ধমূল ধারণা জনমানসে আছে সামান্য বাড়াবাড়ি (যেমন— জ্বর, যদি ১০২/১০৩ ডিগ্রীতে পৌঁছায় বা আরও বৃদ্ধি পায়) হওয়ার উপক্রম হলে, রোগীর উপসর্গগুলি যদি বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয় অর্থাৎ এককথায় রোগের তীব্রতায় যদি সামান্যতম আধিক্য বোধ হয়, তাহলে হোমিওপ্যাথিতে সেই রোগ সামাল দেওয়া অসম্ভব এবং এসব পরিস্থিতিতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা না করাই শ্রেয়।[১৫] হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা তথা বিশ্বাসগুলি সমাজে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ছিলই, এখন এই একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও রয়েছে। এর মূলে আছে এই অসাধারণ চিকিৎসাশাস্ত্রটির চরম অবহেলা, উপযুক্তভাবে একে লালন না করা এবং জনসাধারণের এতে প্রবুদ্ধ না হওয়া। ভ্রান্ত ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে বহু সময়ই এই চিকিৎসার সুফল থেকে রোগী বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ক্ষতি হচ্ছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের, ক্ষতি হচ্ছে রোগারোগ্যকর্মী মানুষের।[১৬]

হোমিওপ্যাথি চর্চাকেন্দ্র

বিনয়ভূষণ রায়ের মতে, ১৮৭৮ সালে ৭ থেকে ৮ জন ছাত্র নিয়ে কলকাতায় একটি হোমিওপ্যাথি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তবে বিশেষ কারণবশত এটি বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। পরবর্তীকালে আবার ১৮৮৩ সালের ১৫ই জানুয়ারি ঢাকায় একটি হোমিওপ্যাথি স্কুল স্থাপিত হয়। প্রাথমিক পর্বে ৭ জন ছাত্র নিয়ে শুরু হলেও প্রায় এক বছরের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৩৮ জন। ১৮৮৪ সালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নিয়ে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণি শুরু হয় এবং ১৮৮৪ সালে যে সমস্ত নতুন ছাত্র ভর্তি হয় তাদেরকে প্রথম শ্রেণিতে স্থান দেওয়া হয়। পাঠ্যক্রমের মধ্যে ছিল চিকিৎসাতত্ত্ব, যন্ত্রচিকিৎসা, ওষুধতত্ত্ব, শারীরবিধানতত্ত্ব, মিডওয়াইফারি। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ে তোলা হয়, যেখানে শিক্ষক হিসাবে পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য, রেবতীমোহন দত্ত এবং পূর্ণচন্দ্র সেনের নাম পাওয়া যায়। চিকিৎসক সম্প্রদায় ও সাধারণ লোকের অভাব দূরীকরণের জন্য ১৮৮৩ সালে ৮০ নং বিডন স্ট্রিটে স্থাপিত হয় 'কলিকাতা হোমিওপ্যাথি বিদ্যালয়'। ভর্তি ফি ছিল দু-টাকা এবং মাসিক বেতন ছিল দু-টাকা। এই বিদ্যালয়ে ভেষজতত্ত্ব পড়াতেন পি. সি. মজুমদার, শারীরতত্ত্ব ও শারীরবিধান পড়াতেন বি. এন. বসু, চিকিৎসাতত্ত্ব পড়াতেন এম. এম. বসু।[১৭] কিন্তু বিদ্যালয়টি স্থাপিত হওয়ার কিছু দিনের মধ্যে ডাঃ মোহিনীমোহন বসু ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে বিদ্যালয়টি দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। মোহিনীমোহন বসু 'বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক স্কুল' স্থাপন করেন যেখানে ছাত্রদের মেটিরিয়া মেডিকা, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং প্রাকটিস অব মেডিসিনের শিক্ষা দেওয়া হয়। এক বছরের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৪ জন। সপ্তাহে প্রতি সোম, বুধ, বৃহস্পতি এবং শণিবার বিকাল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ক্লাস হত। তৎকালীন বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে রসায়নবিদ আচার্য

প্রফুল্লচন্দ্র রায় সিটি কলেজের ছাত্রদের কার্বলিক অ্যাসিড সম্পর্কে এবং জগদীশচন্দ্র বসু 'Plant Theory' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করতেন।[১৮]

চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় তৎকালীন পত্রপত্রিকার ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উলেখযোগ্য, যেমন – দি ইন্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিক্যাল সায়েন্স, দি ক্যালকাটা মেডিক্যাল নিউজ, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট প্রভৃতি। তবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাটি ছিল ১৮৬৮ সালে মহেন্দ্রলাল সরকারের 'দি ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন'। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রসঙ্গে প্রকাশিত সংবাদটি ছিল এইরূপ যে— "হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কলকাতায় যে অনুপ্রবেশ হয়েছে তা বলা বাহুল্য। এই চিকিৎসাপ্রণালী শিক্ষার্থে ৩/৪টি বিদ্যালয় স্থাপন হয়েছে, তাদের মধ্যে ডাঃ মোহিনীমোহন বসুর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি সর্বপ্রধান। এর ক্লাস সিটি কলেজ গৃহে নেওয়া হত। মির্জাপুর স্ট্রীটে ৩ নং ভবনে বাঙ্গালায় হোমিওপ্যাথি শিক্ষা দেবার জন্য এক রজনী বিদ্যালয় আছে"।[১৯] ঢাকা হোমিওপ্যাথিক স্কুলের পক্ষ থেকে 'হোমিয়োপেথিক প্রচারক' নামে অফিস পত্রিকা সেই সময় প্রকাশিত হয়, যার বার্ষিক মূল্য ছিল ৩ টাকা।

স্থাপিত হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল

প্রাথমিকভাবে জানা যায় ১৮৫১ সালে ফরাসি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সি. ফেবরি টনোয়ার স্যার জন হান্টার লিটলারের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় একটি হাসপাতাল এবং অবৈতনিক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৮৫২ সালের ১৭ই মার্চ রোগী ভর্তি হতে শুরু করে। কিন্তু আর্থিক অনটনের জন্য প্রায় দেড় বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে চিৎপুরের পূর্বদিকে বড়তলা অঞ্চলে ওই হাসপাতালটি স্থাপন করা হয়। কালিদাস দত্ত ও শ্যামসুন্দর মিত্র তার সচিব এবং মতিলাল গুপ্ত তার সহকারী চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন। কলকাতার সমস্ত এলাকার রোগীই সেখানে ভর্তি হতে থাকে, এমনকি পরবর্তী ছয় মাসে হাসপাতালের বেড কখনো ফাঁকা থাকেনি। এ প্রসঙ্গে 'দি ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' পত্রিকাটি এই হাসপাতালের রোগী আরোগ্যলাভের একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করেছে তা হল— হাঁপানি রোগের রোগমুক্ত রোগীর সংখ্যা ২২ জন, নেত্রদাহ রোগের ১৪ জন, প্লীহাঘটিত রোগের ১৮ জন, দীর্ঘস্থায়ী ব্রঙ্কাইটিসের ১৩ জন, দীর্ঘস্থায়ী উদারময়-এর ৯ জন, আমাশয় রোগের ১০ জন, দীর্ঘস্থায়ী আমাশয়ের ১৮ জন, অজীর্ণ রোগের ৩৮ জন, জ্বরের ৫৩ জন, বাতের ৬১ জন, গনেরিয়ার ২০ জন এবং কলেরা রোগের রোগমুক্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১৮ জন। আবার সম্পাদকীয় প্রতিবেদন থেকে এই হাসপাতালের খরচের একটি হিসাব ছিল এইরূপ যে – বাড়িভাড়া ৩৪৩ টাকা ১২ আনা, চাকরের মাহিনা ৪০৯ টাকা, আসবাবপত্র ৮০ টাকা ৭ আনা, বই-খাতাপত্র ও লেখার সরঞ্জাম ৪৭ টাকা ৩ আনা, দেশীয় খাদ্য ১১৫ টাকা ৪ আনা ৬ পাই, ডিসপেনসারির খরচ বাবদ ১৪২ টাকা ২ আনা ৩ পাই, প্রতিষ্ঠানের খরচ ১৪৫ টাকা ১২ আনা ৯ পাই এবং অন্যান্য খরচ ৩০ টাকা বাবদ মোট খরচ ছিল ১৩১৩ টাকা ১০ আনা ৩ পাই।[২০] এরপর ১৮৮৩ সালে 'দি ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' এ প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায় – বোম্বাই শহরে একটি হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল স্থাপনের জন্য অবস্থাপন্ন লোকেরা একটা সভা করে। বিনা পয়সায় দরিদ্র জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য মহেন্দ্রলাল সরকার ব্যক্তিগতভাবে নিজের বাড়িতে একটি হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারি স্থাপন করেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা এর প্রয়োজনীতা স্বীকার করে।

তৎকালীন চিকিৎসকগণ

ঔপনিবেশিক আমলে যে সমস্ত ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজেন্দ্রলাল দত্ত, বিদ্যাসাগর, মহেন্দ্রলাল সরকার, মোহিনীমোহন বসু, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডি. এন. রায়, শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। রাজেন্দ্রলাল দত্ত ছিলেন ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রথম প্রচারক। তিনি বিদ্যাসাগরের চেয়ে দু-বছরের বড়ো ছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের দু-বছর আগে প্রয়াত হয়েছিলেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন রাজেন্দ্রলাল দত্ত। তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং রামতনু লাহিড়ীর

সহপাঠী। তাঁর চিকিৎসাকার্য শুরু হয় অ্যালোপ্যাথি দিয়ে। কিন্তু প্রত্যাশিত ফল লাভ না হওয়ায় তিনি চিকিৎসক ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় একটি অ্যালোপ্যাথি ডিসপেনসারি খোলেন। ১৮৬৪ সালে রাজেন্দ্রলাল দত্ত একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় শুরু করেন। কলকাতায় আগত ফরাসি চিকিৎসক তিয়েনেৎ দ্য বেরিগঁ-এর কাছেই তিনি চিকিৎসা শেখেন।[২১] যে সমস্ত রোগী তাঁর চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন – রাধাকান্ত দেব, জয়পুরের মহারাজা, উমেশচন্দ্র ঘোষ এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।[২] হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে মানবদরদী বিদ্যাসাগরের বিস্ময়কর সম্পর্ক আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না। এ প্রসঙ্গে বিহারীলাল উল্লেখ করেন যে – "এই সময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতি ও প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। ১৮৬৬ সালে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ বেরিনী সাহেব কলকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। রাজেন্দ্রবাবু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সেবনে রাজকৃষ্ণবাবু নিদারুণ মলকৃচ্ছতা পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ বাবুকে মলত্যাগ করিবার সময় পিচকারী ব্যভার করতে হইত। এহেন রোগ কেবল হোমিওপ্যাথিকের বিন্দু পানে আরাম হইল দেখিয়া বিদ্যসাগর মহাশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। অতঃপর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ে তিনি সবিশেষ মনযোগ করেন"।[২৩] বিদ্যাসাগর কলকাতার সুকিয়াস্ট্রীটনিবাসী ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষের কাছ থেকে এই চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ নিতেন। তিনি বহু সংখ্যক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বই কিনেছিলেন এবং সেগুলি অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে শবব্যবচ্ছেদ ব্যতীত শিক্ষা অসম্পূর্ণ বলে তিনি কিছু নরকঙ্কাল কিনে, মানবদেহের গঠনবিন্যাস সম্পর্কে অনুশীলনে মগ্ন হতেন। তিনি যেখানেই যেতেন সর্বত্র তাঁর ব্যাগে হোমিওপ্যাথি পুস্তক ও হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স থাকত।[২৪] রোগীর সেবায়ও তিনি অনন্য। কলেরা মহামারীর সময় কর্মাটারে সাঁওতালপল্লীতে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। তাঁর আগে ভারতবর্ষে আর কোনো মনীষী প্রান্তিক মানুষের সামাজিক উন্নয়নের জন্য এমন নিবিড় আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসেননি। বুঝতে আদৌ অসুবিধা হয় না যে, কর্মাটারে গরিব আদিবাসীদের রোগযন্ত্রণায় ব্যথিত হয়েই তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চালু করেছিলেন। ১৮৭৭ সালটি চিকিৎসা পরিষেবায় তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগের পক্ষে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেননা সেই সময়কালে তিনি কর্মাটারেই অবস্থান করছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন – "তিনি প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশঘটিকা পর্যন্ত সাঁওতাল রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন এবং পথ্যের জন্য সাগু, বাতাসা, মিছরি প্রভৃতি নিজ হইতে প্রদান করিতেন"।[২৫]

এরপরে আসা যাক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের কথায়। ১৮৬০ সালে এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মহেন্দ্রলাল অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা শুরু করেন। ১৮৬৩ সালে এম. ডি. পরীক্ষায় প্রথম হন। প্রথমে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির সমালোচক ছিলেন। পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিদ্যাসাগরের চিকিৎসাপদ্ধতি লক্ষ করে তিনি হোমিওপ্যাথির প্রতি আকৃষ্ট হন। ডাঃ সরকারের অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগকে ভারতবর্ষের চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে এক দিক নির্দেশক ঘটনা হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায়। তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যাকে হাতুড়ে চিকিৎসাব্যবস্থা বলে অভিহিত করলেও পরবর্তীকালে মরগ্যানের 'ফিলোজফি অফ হোমিওপ্যাথি' বইটি পাঠ করে হোমিওপ্যাথির প্রতি আকৃষ্ট হন। এই ঘটনার পরে তিনি নিজ সম্পাদনায় *'দি ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন'* নামে চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় হোমিওপ্যাথির পক্ষে কলম ধরার পাশাপাশি তিনি ঔপনিবেশিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমাজপতিদের বিরুদ্ধে প্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।[২৬] মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা শুরু করেন। যেমন—Homeopathy in the new edition of the Encyclopedia Britannica, New school or Homeopathic treatment: Distinctive characteristics of the school, The progress of Homeopathy in India, Present position of Homeopathy in India, What about the Lachesis, are we still depending upon Herring's original supply. এছাড়া মহেন্দ্রলাল বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় হোমিওপ্যাথির ওপর বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখেন। বিশেষ বিশেষ পত্র-পত্রিকাগুলি হল—*Indian Medical Gazetter, The British Journal Of Homeopathy, The*

Monthly Homeopathy Review, The American Homeopathic Observer, The Western Homeopathic Observer, The American Homeopathist প্রভৃতি।[২৭] হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে মোহিনীমোহন বসুর অবদানও বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের পর আমেরিকা যান এবং 'নিউইয়র্ক হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ ও ফ্লাওয়ার হাসপাতালে' হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ১৮৭৯ সালে কলকাতায় ফিরে এসে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে যুক্তভাবে 'কলিকাতা স্কুল অফ হোমিওপ্যাথি' স্থাপন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মনোমালিন্য হওয়ার কারণে তিনি পৃথকভাবে 'বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক স্কুল' স্থাপন করেন।তাঁর মৃত্যুর পরে দুটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়ে Calcutta Homeopathic Medical College & Hospital নাম ধারণ করে।[২৮] চিকিৎসক লোকনাথ মৈত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রবেশ করেন। হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকায় তাঁর প্রচুর দখল ছিল। তিনি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করার আগেই 'হোমিওপ্যাথিক প্রথম চিকিৎসা' নামে একখানি বই লেখেন। 'Calcutta School of Homeopathy' তাঁরই প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। আমেরিকায় অনুষ্ঠিত 'World Medical Congress' এ যোগ দেওয়ার জন্য 'American Institute of Homeopathy'-এর পক্ষ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তাতে যোগ দেন এবং 'India is the hot bet of Cholera and Maleria' এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি একবার দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সুস্থ করেন। এটা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথিতে আকৃষ্ট হন।[২৯] পরবর্তী বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ছিলেন ডাঃ ডি. এন. রায়। তিনি নিউইয়র্ক হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ থেকে হোমিওপ্যাথিতে এম. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। একবার একজন কলেরা রোগী প্রতাপ মজুমদারের কাছে চিকিৎসা করাতে এসে তাঁকে না পেয়ে ডাঃ রায়ের সরণাপন্ন হলে তিনি দ্রুত তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। ডাঃ রায়ের সুবিখ্যাত বইগুলির মধ্যে A Treatment of Cholera, Plague and its treatment, An exposition of the Homeopathic Law Care উল্লেখযোগ্য।[৩০] জ্ঞান মজুমদার (প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জেষ্ঠ্যপুত্র) কলকাতার প্রবাদপ্রতিম হোমিওপ্যাথ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে হোমিওপ্যাথির নানা বই প্রকাশ করেন এবং 'Indian Homeopathic Review' নামে একটি পত্রিকাও প্রবর্তন করেন। ১৮৩১ সালে কলকাতায় প্রথম All Bengal Assam Homeopathic Conference এরও তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৩১] সমসাময়িককালে ডাঃ শরৎচন্দ্র ঘোষও একজন সুপ্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথি ছিলেন। প্লেগ, ডায়বেটিস, বেরিবেরি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের উপর তাঁর কাজ রয়েছে। এছাড়া ভবানীপুরের ডাঃ রামময় রায়, ঢাকার ডাঃ রাধাকান্ত ঘোষ, বাঁকিপুরের ডাঃ যদুনাথ পালিত, প্রেসিডেন্সি কলেজের ডাঃ পি. সি. সরকার প্রমুখ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নাম হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশস্ত্রের ক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে।[৩২]

সম্ভাবনা ও প্রাসঙ্গিকতা

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের সম্ভাবনা ও প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টিও বর্তমানে আলোচিত নিবন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে দেখা যায় সচেতনতার অভাবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অপব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। 'এই ওষুধে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই'—এই বিশ্বাসও তাঁর অন্যতম কারণ। বই পড়ে নির্দ্বিধায় মুড়ি-মুড়কির মতো ওষুধ অনেকেই নিজেও সেবন করছেন ও অপরকেও করাচ্ছেন দাতব্য চিকিৎসার নামান্তরে। হোমিওপ্যাথিতে পেটেন্ট ওষুধের এখন ছড়াছড়ি। বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুত কারকগণ নানাবিধ পেটেন্ট ওষুধ তৈরি করছে বা করে চলেছে। বিক্রয় হচ্ছেও খুব, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে। পেটেন্ট ওষুধ হল কোনো নির্দিষ্ট নামের রোগের চিকিৎসার জন্য যদি কোনো ওষুধ প্রস্তুতকারক নিজস্ব ফর্মুলা অনুযায়ী ওষুধ তৈরি করে দেয়, সেই রোগের ওষুধটিকে তখন সেই প্রস্তুত কারকের পেটেন্ট ওষুধ বলা হয়।[৩৩] হোমিওপ্যাথি শুধু দর্শন ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাই নয়, প্রকৃত হোমিওপ্যাথি প্রেসক্রিপশন এক ধ্রুপদী শিল্প বিশেষ। উক্ত চিকিৎসায় ওষুধ নির্বাচনে জ্ঞান ও দক্ষতা চাই। "সমস্ত রোগেরই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আছে"—এই দাবি ঠিক নয়। প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বব্রহ্মান্ডে বিজ্ঞানসহ সমস্ত কিছুরই সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতা হোমিওপ্যাথিক নামক

ওষুধ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও আছে। হোমিওপ্যাথির জনক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান বলেছেন— সমস্ত রোগের চিকিৎসায় ওষুধ প্রয়োগ একটি নির্দিষ্ট নিয়মকানুন অনুসারে করতে হবে। হয় রোগের বিপরীত লক্ষণ সৃষ্টিকারী ঔষধ (Antipathy) প্রয়োগ করতে হবে নয়তো রোগের সমলক্ষণ সৃষ্টিকারী ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। প্রথমস্থলে প্রথমাবস্থায় সাময়িক উপশম হলেও রোগাবস্থাটির প্রাবল্য বৃদ্ধি পায় পরবর্তী অবস্থায়। কিন্তু দ্বিতীয়স্থলে স্থায়ী নিরাময় হয়। আমাদের উচিৎ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অনুসারে নির্ভুল দিশায় অগ্রসর হওয়া, স্বয়ং হ্যানিম্যান সমগ্র চিকিৎসক সমাজকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৪] প্রায় সমস্ত রোগের অন্তরালে আছে মায়াজমের ভূমিকা। মায়াজম কথাটির আভিধানিক অর্থ 'এমন কোনো জিনিস যা শরীরকে দূষিত করে'। মায়াজমের প্রভাবে জিন দূষিত হয়। আবার লক্ষ করা গেছে প্রাথমিকভাবে প্রায় ৮৫ শতাংশ ক্যান্সারই কিডনিতে হয়। তাছাড়া বাকি ১৫ শতাংশ ক্যান্সার শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে হয়। পুরুষদের এই ক্যান্সার স্ত্রীলোকেদের তুলনায় দ্বিগুণ। তাছাড়া ৫০-৬০ বছর বয়সের মধ্যে এই ক্যান্সার বেশি হয়।[৩৫] ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারে হোমিওপ্যাথি ওষুধ যেমন— কোভিষ্টা, ল্যাকেসিস, মোডোরিনাম ও কলোসিন্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।[৩৬] গ্রীষ্ম যেতে না যেতেই হুড়মুড় করে এসে যায় বর্ষাকাল, বিশেষত গ্রীষ্মকালে শেষ ও বর্ষার শুরু -এই ঋতু পরিবর্তনের সময়টাতে শিশুরা সাধারণত জ্বর, সর্দি, কাশি, পেটের অসুখ ইত্যাদির শিকার হয়। বয়স্করা এই সময় চর্ম রোগের কবলে পড়েন।[৩৭] হ্যানিম্যানের মৃত্যুর পর তাঁর আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথি অচল, অথর্ব হয়ে পড়েনি। গতি পেয়ে যাওয়া নব্য ধারায় এই চিকিৎসা পদ্ধতি দেশে বিদেশে বিস্তৃত হতে থাকল। ১৮৫১ খ্রিঃ থেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, যা আজ সারা দেশের সমস্ত প্রান্তে আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তে হোমিওপ্যাথি প্রসার লাভ করলেও পশ্চিমবঙ্গে এর বিস্তৃতি সব থেকে বেশি, বস্তুত জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে বিচার করলে পশ্চিমবঙ্গের স্থানই সর্বাগ্রে। দেশের প্রথম হোমিওপ্যাথি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'Calcutta Homeopathic Medical College and Hospital' —১৮৮১ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা, চিকিৎসা ও গবেষণার জন্য দেশের প্রথম ও একমাত্র সর্বোচ্চ মডেল শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে 'National Institute of Homeopathy' ১৯৭৫ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৮]

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে হোমিওপ্যাথি শিল্প চরম সংকটের মুখে। এ প্রসঙ্গে ইকোনমিক হোমিও ফার্মেসীর শ্রী বিকাশচন্দ্র রায় বলেন— সুরাসারের অভাবে তাঁদের কারখানায় উৎপাদন প্রায় বন্ধ। এই দ্রব্যটি তাঁদের দৈনিক যেখানে ১,৮০০ লিটারের দরকার সেখানে ৪০০ লিটার পাওয়াই স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ডাক্স ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর অন্যতম কর্ণধার উমাশঙ্কর দে জানান— সুরাসাবের যোগান এরাজ্যে অনিয়মিত এবং বর্তমানে একেবারেই বন্ধ। ফলে এর জায়গায় অন্য রাজ্যের কোম্পানিগুলি বাজার দখল করে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হোমিওপ্যাথিক শিল্পের প্রসারে বেশ কিছু উদ্যোগ নিলেও শিল্প রক্ষার ব্যাপারে উদাসীন। হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথি ল্যাবরেটরির প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সুধীরচন্দ্র দেব মনে করেন যে, হোমিওপ্যাথিতে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের পথনির্দেশক। সমস্ত ভারতের হোমিওপ্যাথি ঔষধের প্রায় ৯০ শতাংশ ওষুধের উৎপাদন এখানে হয়। কিন্তু পরিতাপের ব্যাপার হলো যে, রাজ্য হোমিওপ্যাথিকে শিল্পের মর্যাদা দিল এবং যারা সমস্ত এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে দিল দেশে তাঁদের শিল্পেই আজ অন্ধকারের অনিশ্চয়তা।[৩৯] রাজ্যগুলি সুরাশিল্পের জন্য যে পরিমাণ সুরাসার বা অ্যালকোহল উদার হস্তে ব্যয় করে তার দশভাগের এক ভাগ হোমিওপ্যাথি ভেষজ শিল্পের জন্য যদি ব্যয় করত তবে হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এরাজ্যে বর্তমানে এই চরম সঙ্কট সৃষ্টি হত না।[৪০] এই চিকিৎসাব্যবস্থাটি কিছু ইউরোপীয় কর্মচারী এবং কিছু ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তৎকালীন কিছু নামজাদা অ্যালোপ্যাথি এবং ব্রিটিশ সরকার কিন্তু এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিদ্যাকে 'হাতুড়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা' ছাড়া আর কিছুই মনে করতেন না। ব্রিটিশ সরকার চিন্তাই করতে পারত না যে, এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থা কোনো দিন পাশ্চাত্য চিকিৎসাব্যবস্থার পরিপূরক হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশিরভাগ দেশবাসীর কাছে এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থা এর সস্তা মূল্য, সহজলভ্যতা, ও এর সরল চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাই বলা যায় যে, তৎকালীন সময়ে এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাব্যবস্থা ও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাব্যবস্থার মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই বর্তমান ছিল।[৪১]

হোমিওপ্যাথির প্রচার আমাদের দেশে যথেষ্ট হয়েছে, তারই ফলস্বরূপ আজ প্রায় প্রতি ঘরেই গৃহ চিকিৎসা বাক্স ও গৃহ চিকিৎসার বই আছে। এই চিকিৎসা আদৌ রোগ ধরে তা নয়, ঔষধের লক্ষণগুলি চিনে রাখাই হল হোমিওপ্যাথির প্রধান কর্তব্য।[৪২] অধুনা রাজধানীতে হোমিওপ্যাথির বিশেষ আদর এবং অনেক হারেও বিশেষ প্রচলন দেখা যায়।[৪৩] কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপর আস্থা রাখতেন। তাঁর বক্তব্যে সেই সুর শোনা যায় – "I have long been an ardent believer in the science of Homeopathey and I feel happy that it has got now greater hold in India than even in the land…of the indo German homeopathic review which I hope will be a popular forum of scientific discussion."[৪৪]

সূত্র নির্দেশ:

১. ভট্টাচার্য, মহেশচন্দ্র, (১৩৫৩ ব.), *হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা,* ইকনমিক ফার্মেসি, পৃ. ১।

২. পালিত, চিত্তব্রত, (২০১৪), *জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার জনক মহেন্দ্রলাল সরকার,* কৃতি, পৃ. ৯১।

৩. Ghosh, Sarat Chandra, (1935), *Life of Dr. Mahendra Lal Sirkar,* p. 32-34.

৪. সাহা, কিরাট কুমার, (২০০১), *হোমিওপ্যাথি দর্শন ও বিজ্ঞান,* মহিলা মঙ্গল, পৃ. ২২-২৩।

৫. মিত্র, আরুণ কুমার, (১৯৭০), *অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য, দি ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন,* পৃ. ২৬, ৩৯৭।

৬. *বসুমতি মাসিক পত্রিকা,* (মাঘ, ১৩৩১ ব.), পৃ. ৩২৬।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ, (১৩৭৬ ব.), *বিদ্যাসাগার,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ. ৪৮৯।

৮. Study of Homeopathy in India, *Calcutta Journal of Medicine,* (August, 1996). vol-xv, no.8, p. 33.

৯. সাহা, কিরাট কুমার, (২০০১), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮-২৯।

১০. *তদেব,* পৃ. ৩০।

১১. দাস, বি. এম., (১৩১২ ব.), *হোমিওপ্যাথি - বিজ্ঞান, ফিল্যান থ্রপিকেল ফার্মাসি,* পৃ. ৮৮-৮৯।

১২. সাহা, কিরাট কুমার, (২০০১), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৪-৩৫।

১৩. সূর, রাজেন্দ্রলাল, (১৩২১ ব.), *হোমিওপ্যাথিক –চিকিৎসারত্ন,* শ্রীরামলালসুর প্রকাশনী, পৃ. ৯৬।

১৪. সাহা, কিরাট কুমার, (২০০১), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৬-৩৭।

১৫. রায়, জগচ্চন্দ্র, (১৯১২), *হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞান,* ভারতী মিহির প্রেস, পৃ. ১৮৩।

১৬. সাহা, কিরাট কুমার, (২০০১), *পূর্বোক্ত,* ৩৯.।

১৭. রায়, বিনয়ভূষণ, (২০০৫), *চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস: উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব,* সাহিত্যলোক, পৃ. ২৬৭।

১৮. বসু, এম.এম. এবং ঘোষ, শরৎচন্দ্র, (১৩৪৭ ব.), *দ্রষ্টব্য হ্যানিম্যান,* ২য় সংখ্যা, পৃ. ৬৯।

১৯. হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল, (১৮৮৫), *দ্রষ্টব্য বামাবোধিনী,* আগস্ট, পৃ. ৯৯।

২০. রায়, বিনয়ভূষণ, (২০০৫), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৬৩-২৬৫।

২১. চক্রবর্তী, শ্যামল, (২০০১), *বিজ্ঞানমনন ও বিদ্যাসাগর,* দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩২।

২২. রায়, বিনয়ভূষণ, (২০০৫), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৬৮।

২৩. সরকার, বিহারীলাল, (১৩০২ ব.), *বিদ্যাসাগর,* নবপত্র প্রকাশন, পৃ. ২৮০-২৮১।

২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তড়িৎ কুমার, (২০০০), *বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমানস,* দীপ প্রকাশন, পৃ. ২০।

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব, (২০১৯), প্রান্তিক মানুষের বন্ধু বিদ্যাসাগর, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মুখপত্র,* বর্ষ ৫২, সংখ্যা ৩-৭, পৃ. ৭৮-৭৯।

২৬. পালিত, চিত্তব্রত, (২০১৪), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৪-২৮।

২৭. *তদেব,* পৃ. ১০০-১০১।

২৮. রায়, বিনয়ভূষণ, (২০০৫), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৬৮-২৬৯।

২৯. *তদেব,* পৃ. ২৬৯।

৩০. পালিত, চিত্তব্রত, (২০১৪), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৮৫।

৩১. *তদেব,* পৃ. ১৮৫-১৮৬।

৩২. *তদেব,* পৃ. ১৮৬।

৩৩. Smith, Trevor, (1982). *Homeopathic Medicine: a Doctors Guide to Remedies for Common Ailments,* B. Jain Published, p. 221.

৩৪. সাহা, কিরাট কুমার, (২০০১), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫০-৫১।

৩৫. *হোমিওযোগা ডায়েট হাইড ওয়ার্ল্ড,* (২০১৯), দশমবর্ষ, সংখ্যা ১১১, পৃ. ২।

৩৬. *হোমিওযোগা ডায়েট হাইড ওয়ার্ল্ড,* (২০১৯), নবমবর্ষ, সংখ্যা ১১৮, পৃ. ৩।

৩৭. *হোমিও স্পেক্ট্রা,* (২০১৯), ষষ্টদশবর্ষ, সংখ্যা ১৮৭, পৃ. ৩।

৩৮. সাহা, কিরাট কুমার, (২০০১), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৭১।

৩৯. পশ্চিমবঙ্গে হোমিওপ্যাথি শিল্প চরম সংকটের মুখে, (১৯৮৫), *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৯ নভেম্বর, পৃ. ৬।

৪০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয়, (১৯৮৫), হাতের কাছে রাখুন কিছু হোমিও, *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৯ ই নভেম্বর, পৃ. ৬।

৪১. পালিত, চিত্তব্রত, (২০১৪), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১১২।

৪২. বিশ্বাস, রাধারমন, (১৪০৩ ব.), *হোমিওপ্যাথিক পকেট মেটিরিয়া মেডিকা,* হ্যানিম্যান পাবলিশিং, পৃ. ৫।

৪৩. ঘোষবর্মা, বিধিভুষণ, (১৩১৯ ব.), *হোমিওপ্যাথিতে সনিদান সবিরাম জ্বর চিকিৎসা,* এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়াকর্স, পৃ. ৩।

৪৪. সাহা, কিরাট কুমার, (২০০১), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১০২।